এইখানে পা রাখিস

লীলা মজুমদার

প্রথম প্রকাশ

আনন্দমেলা

২৩ জুলাই ১৯৮৬

বৈদ্যুতিন প্রকাশক

https://kheladhulo.blogspot.com

পরিকল্পনা -সুজিত কুণ্ডু ০ রূপায়ন -স্নেহময় বিশ্বাস

এইখানে পা রাখিস

লীলা মজুমদার

গঙ্গাঘাটের কাছে লম্বা কারখানা। তার পেছনে বেশ খানিকটা ঘেরা জায়গা। একধারে কারখানার ঠাণ্ডাঘর। আরেক ধারে গুদোমবাড়ির দশ ফুট পাঁচিল। তার উপর দিয়ে তাদের মস্ত বারোমেসে আমগাছের ডালপালাগুলো এদিকে ঝুলে আছে, ওধারে বাড়বার জায়গা পায় না। অন্যদিকে একটা বন্ধ ছাপাখানার পেছনদিক। বাকি রইল প্রায় দেড়মানুষ উঁচু লম্বা সামনের দেওয়াল। দেওয়ালের বাইরেই রাস্তা। সে-রাস্তা গিয়ে পড়েছে গঙ্গার ধারের বড় রাস্তায়।

ঘেরা জায়গাতে যাওয়া-আসার পথ নেই। ওর কথা হয়তো কারও মনে নেই। মালিকদেরও না। সবটা ছোট-ছোট ছক্‌-কাটা শান-বাঁধানো। একধারে মাটির তলায় বৃষ্টির জল যাবার নালা আছে, তাতে ঝাঁঝরি বসানো আছে। বর্ষাতেও জল দাঁড়ায় না। ঝাঁঝরির পাশে একটা ভুলে-যাওয়া কলও আছে। এদিকটাতে কারখানার ঠাণ্ডাঘর। অষ্টপ্রহর ঘরঘর শব্দ, ঘুম পায়। একেবারে নিরাপদ। কারও যাওয়া-আসার পথ নেই। দুটো পাঁচিল টপকে ঢুকতে হয়। কেউ জানে না দশটা ছেলে সেখানে আরামে থাকে।

আমগাছে চড়া বারণ; আঁকশি দিয়ে পাড়া বারণ। আপনি পেকে টুপটাপ পড়ে, তখন খেতে বাধা নেই। বাইরেটা টুকটুক করে, তার নীচে খানিকটে মিষ্টি, আঁঠির কাছে টক। বাঁদররা অনায়াসে ডাল বেয়ে ওঠে নামে। রাস্তার ধারে দুটো বটগাছ আছে। তার তলায় গুদোমখানার মাল খালাস করতে সারি-সারি ট্রাক দাঁড়ায়। সারাদিন বাঁদররা বটগাছে নাচানাচি করে। ওদের পোষা পাঁচটা বাঁদর বেশ শিক্ষিত। সারাদিন বটগাছে কিচিরমিচির আর সন্ধে নামলেই ভয়ে কাদা। কিসের এত ভয় তাই বা কে জানে। সারারাত ওদের গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ঘেরা জায়গায় ঢুকলে ওরাও বোকা বনে যায়। বাঁদরগুলো ওদের প্রাণের প্রাণ। একরকম বলা যেতে পারে বাঁদররাই এদের অনেকখানি খাওয়ায় পরায়। বটতলায় ট্রাক বোঝাই হয়, বোঝাই হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। চুরি-ছিনতাইয়ের

ভয়। কিন্তু সবাই জানে পাকু'র বাঁদরদের মাথাপিছু দু'টাকা রুজি হিসাবে ভাড়া দিলে, ট্রাকের কাছে কেউ ঘেঁষেছে কি তাদের চুলের মুঠি ধরে চাঁটিয়ে ভাগাবে। ও বাঁদর চাট্টিখানিক কথা নয়। ট্রাকওয়ালারা ওদের বলে পঞ্চপাণ্ডব। শিখিত-পড়িত জানোয়ার। মানুষের চেয়ে শতগুণে ভাল।

বেশ আছে ওরা ঘেরা ঘরে। ঘর বলতে বন্ধ ছাপাখানার ছাদটা এদিকে অনেকখানি ঝুলে আছে, তার তলাটুকু। চারদিক পাঁচিল ঘেরা, ঘর না তো কী? যেখানে নিরাপদে চক্ষু মোদা যায়, সেই হল ঘর। ঝাড়া হাত-পা সব, সুখেই থাকে ওরা। মা-বাবার বালাই নেই। কেউ বা উঠে-যাওয়া উদ্বাস্তু-শিবির থেকে পালিয়ে এসেছিল, শুনেছিল তাদের নাকি ফেরত পাঠাবে। যেমনি শোনা অমনি ভাগ্, ভাগ! কে পাঠাবে, কোথায় পাঠাবে তা কারও জানা নেই। কিচ্ছু চায়ও না ওর' খালি নিরাপদে থাকতে চায়। ছোটগুলোকে তো পথ থেকে এর' কুড়িয়ে এনেছে। এদের দিয়েই দল গড়তে হয়, যারা হাত-পা ঝাড়া, যাদের পিছুটান নেই পাকু এরকমই খুঁজছিল। একা- .কা কি থাকা যায়!

াকু ওদের পাণ্ডা। একবার বাসের লাইনে দাঁড়ানো একজন ঌাটা লোকের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে মার তো খেয়েইছিল, আবার ফাটকে দেবে বলে তারা ভয়ও দেখিয়েছিল। স্রেফ পালিয়ে বেঁচেছিল। দলের ছেলেদের বলত, 'খবরদার জেলে যাসনি। কাউকে পুলিশে ধরেছে শুনেছি, কি দল থেকে নাম কাটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে, এই জায়গা থেকে বাকিরা হাওয়া হয়ে যাব। আর কখনও আমাদের খুঁজে পাবিনে।'

তাই শুনে সকলের বুক কেঁপে উঠল। খুঁজে পাবে না তারা যাবেটা কোথায়? ছোট-মনাই কেঁদে উঠেছিল, 'বাঁদরদেরও নিয়ে চলে যাবে? নকুল যে রাতে আমার খোঁড়া পায়ে মাথা রেখে ঘুমোয়। অমনি আমার সব ব্যথা সেরে যায়।'

পাকু ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'সে কী রে! কোন কালে তোর ঠ্যাং জোড়া লেগে গেছে, মনে নেই? হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছিলেন হাড় জুড়ে গেছে, একটু খোঁড়াবে, তবে আর কোনও কষ্ট হবে না। দেখি কোথায় ব্যথা করে।'

ছোট-মনাই বুকের কাছটা দেখিয়ে বলে, 'এই যে এইখানটায়।'

পাকু হাসে, 'দূর বোকা, ও তো দুঃখের জ্বালা। ও কিচ্ছু না। ওতে মানুষ মরে না। কাজ করবি পয়সা পাবি, খাবিদাবি নিজের মতো থাকবি। তাইলে পুলিশে ধরবে না। আর দুঃখ তো থাকবেই।'

এই সময় এলোপাথাড়ি দুটো পাঁচিল ডিঙিয়ে মধু ছুটে এল, "পাকুদা, শীত আসছে, তাই দেখলাম মিশনের সামনে লম্বা নাইন দেছে। সবাই একটা করে কালো তুলোট কম্বল পাচ্ছে। যাব নাকি আমরাও? পয়সা নিচ্ছে না।"

পাকু চটে গেল, "লাইন দিবি? কেন, আমরা কি ভিকিরি যে মিনি মাগনার জিনিস নেব? পাণ্ডবরা পর্যন্ত রোজগার করে। নয় তো চরে খায়।"

বটুক বলল, "কাল গোদা এক-ঠোঙা চিনাবাদাম এনেছিল। সেটা কি গাছেই হয়েছিল, না পয়সা দিয়ে কিনেছিল?"

সকলে হাসতে লাগল।

পাকু বলল, "ওদের চরে খাবার অন্য নিয়ম।"

ভোলা হেসে বলল, "চরে নয়, চোরাই করে বল।"

মনাই ব্যস্ত হয়ে উঠল, "না, না, চুরি করেনি গোদা। আমি দেওয়ালের ফুটো দিয়ে দেখেছি বুড়ো ট্রাক-ড্রাইভার ওদের পাঁচজনকে পাঁচ ঠোঙা বাদাম দেছল। ওটা গোদারটা।"

ভোলা বলল, "অ্যাঁ! আমি যে সব খেয়ে ফেললাম! সে তো কিছু বলল না।"

এইখানে গোদা ওর ঘাড়ের উপর হাত রেখে বলল, "খ্যাঁচ-খ্যাঁচ, কিচিরকিচির খক্।"

অর্থাৎ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এসব কথা এখানেই বন্ধ হোক!

বসে থাকে না কেউ। ছোট-মনাইও বসে বসে চমৎকার কাঁথা সেলাই করে; তালপাতার হাতপাখায় ঝালর লাগায়, নকশা আঁকে। ভোলা সেগুলো বুড়ো ওস্তাগরের দোকানে যোগান দেয়। শিশি-বোতল সংগ্রহ করে কেউ; পথে জল দাঁড়ালে গাড়ি ঠেলে দেয়; মোড়ের মাথার ছোট ছাপাখানায় তিনজন সারাদিন কাজ করে। দুপুরে সেখানে তারা গরম হাতরুটি আর চানার ডাল খায়। শনিবার-শনিবার দশটা করে টাকা পায়। পাকু রোজ সন্ধ্যায় গিয়ে নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়ায়। কেউ কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। বেশ ছিল সবাই। মনাই ছাড়া সবাই নাইট-স্কুলে পড়ে। আলাদা আলাদা যায় ওরা। দল বেঁধে কিছু করা বারণ। মালিকের চোখে পড়ে গেলে, অমন আরামের জায়গাতে বাস করা উঠে যাবে। এ-কথা পাকু বারবার বলে। বলে, সত্যি কথা বলতে কী, আমরা হলাম জবরদখলি। যার জায়গা, তাকে না বলে, এখানে আছি। যেই তার এ-জায়গা দরকার হবে, অমনি আমরা চলে যাব।

মনাই কেঁদে বলে, কোথায় চলে যাব? আর জায়গা কোথায়?

॥ দুই ॥

পাকু বলল, "তোকে অত ভাবতে হবে না। ভাবনা থাকলে পাখিরা কি অমন করে গাইতে পারত?"

আমগাছ থেকে তাই শুনে ছোট্ট সাদা-কালো পাখি বলল, "চিকি-চিকি, চিক-চিক, অর্থাৎ ঠিকই, ঠিকই, ঠিক, ঠিক!"

পাকু আরও বলল, "পাখিরা কি কালকের জন্য খাবার জমা করে রাখে? শীতে সাপরা ঘুমোয়, তারাও রাখে না। মৌমাছিরা পিঁপড়েরা রাখে বাচ্চাদের জন্য। নিজেদের জন্যে নয় বোধহয়।"

ভোলা বলল, "বেশ আছি আমরা। রাঁধাবাড়ার বালাই নেই। পাঁড়েজির দোকানে পুরি-সব্‌জি আছে। ঘাটের কিনারায় ছাতু কাঁচালঙ্কা আচার আছে। আমাদের এখানে জলের কল আছে। ফলপাকুড় পাওয়া যায়; গাছ থেকে বছরে তিনবার পাকা আম পড়ে। আবার কী চাই?

শান-বাঁধানো উঠোনের উপর ছেঁড়া মাদুর পেতে টান-টান হয়ে দশটা ছেলে পাঁচটা বাঁদর শুয়ে পড়ল। বটুক বলল, "এ-জায়গাটা বোধহয় বন্ধ ছাপাখানার পিছনের উঠোন। তাই কল আর কলঘর। এদিকের দেওয়ালটাও করোগেটের তৈরি। আসলে একটা মস্ত ফটক। খুললেই ছাপাখানা। আমাদের মোড়ের ছাপাখানার ছটুলাল এইখানেই কাজ শিখেছিল। নাকি দশ বছর বন্ধ আছে। ভাগিদারদের মধ্যে মামলা চলেছে। এবার নাকি সকলের সব টাকা শেষ, কাজেই মামলাও শেষ হবে। ছাপাখানাও নিলেম হবে।"

তাই শুনে পাকু উঠে বসল। "ঠিক জানিস নিলেম হবে? তবে তো আমাদের সরতে হবে। এখানে যে আছি কাকপক্ষী টের পায় না।"

ছোট-মনাই পাকুর গলা জড়িয়ে বলল, "তা হলে কি আমাদের পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে?"

পাকু বলল, "দূর, তা কেন? আমরা তো কারও জিনিস চুরি করিনি। তারা এলে সিরেফ ভিড়ের সঙ্গে মিশে যাব। এটা যে আমাদের আস্তানা তা কেউ টের পাবে না। এবার ঘুমো।"

মনাই তবু নিশ্চিন্ত হয় না, "তুমি যে ওদের পাঁচিলে বুদ্ধদেবের ছবি এঁকেছ, তাই দেখে রাগ করবে না তো?"

বটুক বলল, "দূর বোকা, রাগ করবে কেন? খুশি হবে। কে অমন আঁকতে পারে?"
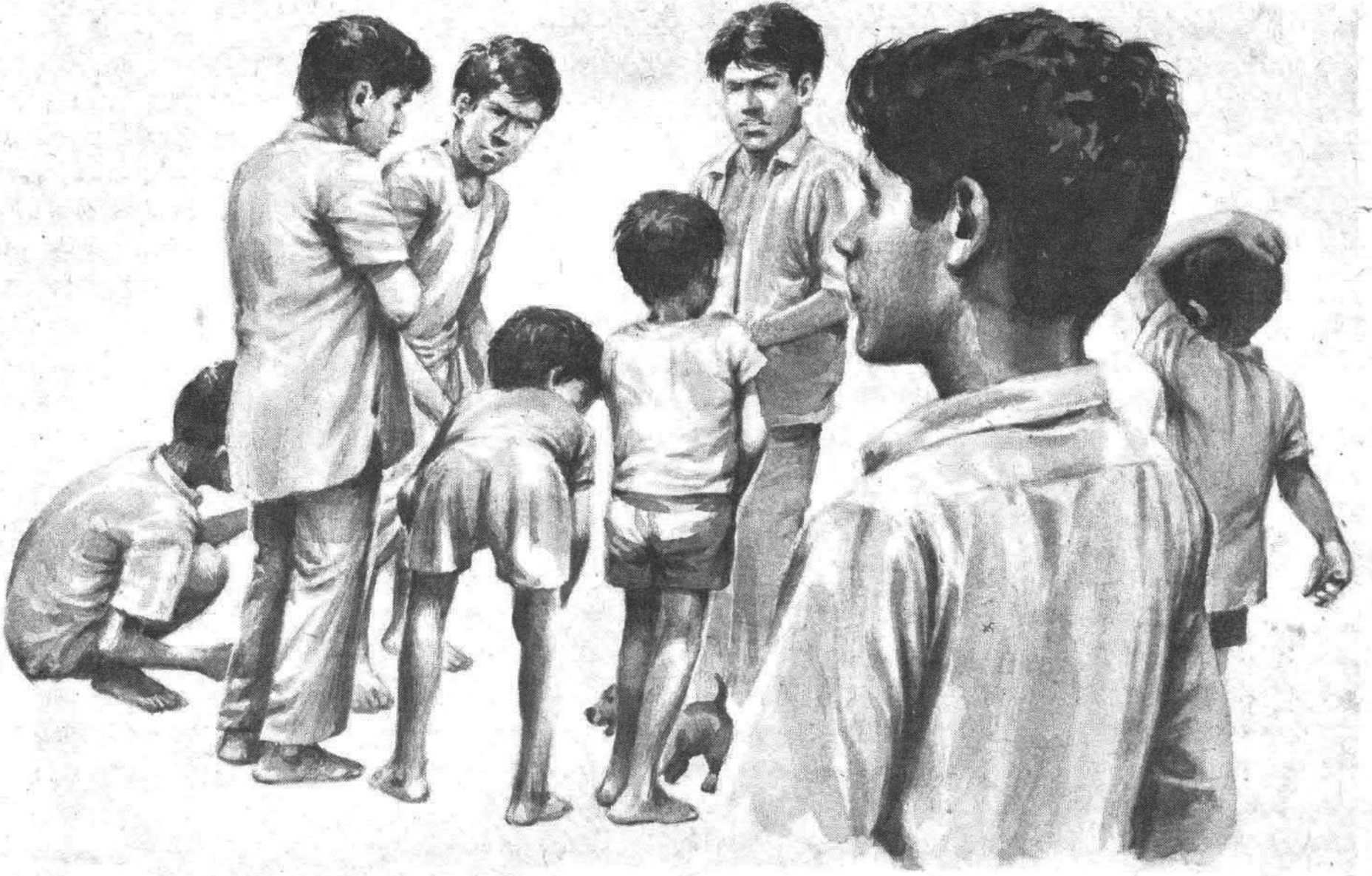
মনাই বলল, "বুদ্ধদেব পাখির দুঃখ দেখে কেঁদেছিলেন, না পাকুদা ?"

পাকু বলল, "হুম।" আর কারও মুখে কথা নেই।

ঠিক সেই সময় বাইরের রাস্তায় পঁক-পঁক, খ্যাঁচ-খ্যাঁচ, দুম্ ! এই রে ! থামা ! থাম ! গেল ! গেল ! গেল ! এই যাঃ ! হয়ে গেল। কিছুতে গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছে। অমনি যে যার উঠে পড়ে পাঁচিলের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দ্যাখে, কী সব্বনাশ ! পানওয়ালি-বুড়িকে চাপা দিয়ে গাড়ি ভেগেছে ! হইচই ! দৌড়োদৌড়ি ! জল আনো ! রিক্শ ডাকো ! রাস্তায় সে কী হট্টগোল। ঠোঁটের উপর আঙুল দিয়ে এদের দশজনকে চুপ থাকতে বলল পাকু। বাঁদররাও দেখছিল। সুয্যি ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তারা বোবা বনে যায়। কিসের এত ভয় বোঝা যায় না। এদের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে। ভোর না হতেই আবার আমগাছ থেকে বটগাছে ঝুলোঝুলি। কিচিরমিচির ! ওদের ফুর্তি দেখে ট্রাকের লোকরা হাসে। পাকুর বাঁদররা বড় ভাল।

এদিকে পানওয়ালি বুড়ি পথের মধ্যিখানে চিত হয়ে হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে। ভিড়ের সবাই হায় হায় করছে ! এমনি সময় চোখ খুলে ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করে, বুড়ি স্পষ্ট গলায় বলল, "আমি মায়ের কাছে যাব। মা যে রান্না করে আমার পথ চেয়ে বসে আছে।" এই বলে আবার শুয়ে পড়ল।

বড়-মুদি দোকানের ঝাঁপ তুলে রিক্শ করে বাড়ি যাবার তালে ছিল। সে হঠাৎ নিচু হয়ে বলল, "এই যে আমি আছি মা, তোমার ছেলে। আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি !" এই বলে তাকে রিক্শতে তুলে কোলে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ভিড়ের লোকে মাথা নেড়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। রাস্তাও চুপচাপ হয়ে গেল।

এরা তবুও পাঁচিলের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ গলিটার ধারে ডাকবাক্সের ছায়া থেকে একটা চাপা কুঁইকুঁই শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল। রোগা পানু এক লাফে আমগাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে, পাশের বাড়ির একফালি জমিতে নেমে, তাদের নিচু পাঁচিল টপকে একেবারে গলিতে পৌঁছে গেল। একটু পরেই পানওয়ালির কুচকুচে কালো কুকুরছানা কোলে করে রোগা পানু আবার যখন ফিরে এল, কারও মুখে কথা নেই। রোগা পানু তাকে আস্তে-আস্তে মাটিতে নামিয়ে দিতেই, বাচ্চাটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে একপাশে হেলে পড়ল। মনে হল, সামনের বাঁ পায়ে ভর দিতে পারছে না। ঠ্যাংটা বোধহয় ভেঙেছে।

পাকু তাকে মনাইয়ের কোলে দিয়ে, চুন, হলুদ, কাঠি, ন্যাকড়া, এই সব জোগাড় করে আনল। তারপর খুব যত্ন করে পায়ে ওষুধ লাগিয়ে, কাঠি বেঁধে ব্যান্ডেজ করে দিল। শুতে-শুতে অনেক রাত হয়ে গেল।

পাশের কারখানার লোকরা মালিকের বাবার একশো বছরের জন্মদিন করছিল। গান বাজনা, নাটক, খাওয়াদাওয়া হচ্ছিল। পাকু বলেছিল, নৈশ-বিদ্যালয়ের ছেলেদেরও নেমন্তন্ন আছে। যায়নি কেউ। পাকুও যায়নি। যেখানে বাইরের লোক জড়ো হয়, পাকু নিজেও সেখানে যায় না, এদেরও মানা করে। বলে, 'যত কম জানাজানি হয়, আমরা তত নিরাপদ।' তাই হবে হয়তো। জবরদখলি ওরা, কে কবে তাড়াবার চেষ্টা করে তাই বা কে বলতে পারে। দৈবাৎ জায়গাটা পেয়ে গেছিল পাকু। সেই যখন পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল, এই অন্ধ গলিতে দেড়মানুষ-উঁচু পাঁচিল দেখে, খাঁজে-খোঁদলে পা গুঁজে ভিতরকার এই চমৎকার চারদিক-ঘেরা, সবার ভুলে-যাওয়া জায়গাটে খুঁজে পেয়েছিল।

তখন সে একা ছিল। চায়ের দোকানে কাজ পেয়েছিল। বড় কষ্টে দিন কেটেছিল। রাতে কাঁদত। এখন সব কান্না শুকিয়ে গেছে। এগুলোর জন্য ভাবতে হয়, ওসব বড়মানুষির সময় কোথায় ? ফেরারি উদ্বাস্তুদের তিনজনকে হাওড়া স্টেশনে পেয়েছিল। বাকিগুলোও একে একে জুটেছিল। বেশ আছে ওরা, সুখে আছে।

তবু মাঝে-মাঝে পাকুর···মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিল পাকু।

মাধু বলল, "আমারও লাচ গান লাটক খাওয়াদাওয়া খুব ভাল লাগে, পাকুদা। আমাদের কেন জন্মদিন হয় না ?"

গজু বলল, "দূর বোকা, আমরা কি জন্মেছি যে আমাদের জন্মদিন হবে ? তা হলে তো একটা মা'ও থাকত আমাদের। আমাদের পথ থেকে তুলে এনেছিলে, না পাকুদা ?"

পাকু বলল, "হুম।" ওর জামার মধ্যে গোঁজা কুকুরবাচ্চাটাও হঠাৎ গুমরে উঠল। ওটারও তো একটা মা থাকা উচিত ছিল।

মাধু আবার বলল, "মালিকের বাবা নাকি কুড়ি বছর আগে মারা গেছে, তার জন্মদিন হতে পারে আর আমরা জন্মাইনি বলে আমাদের হবে না ?"

পাকু কুকুরবাচ্চার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "অ্যাঁ, কী বললি ? জন্মদিন ? তার চেয়ে কাল এটার নামকরণ করলে কেমন হয় ? জাহাজঘাটায় দেখে এলাম খুব শস্তায় ঝুড়ি-ঝুড়ি আপেল বেচে দিচ্ছে। মাল-জাহাজের হিমঘর খারাপ হয়ে গেছে, সব পচে যাবার ভয় আছে। কাল কিছু টাকা কামিয়েছি। আপেল কিনব আর দশ টাকা দিয়ে কচুরি-সন্দেশ কিনব, কী বলিস ?"

সকলে মহা খুশি। গোদা পর্যন্ত মুলোর মতো দাঁত বের করে হাসতে লাগল। মনাই বলল, "কী নাম হবে ওর ?"

"কালো কুকুরের কেষ্ট ছাড়া আবার কী নাম হতে পারে ?"

বটুক বলল, "কেন কালু, কালা, কুচ্‌কুচে, কত কী হতে পারত। তবে কেষ্টর মতো কিছু নয়।" মনাই কুকুরবাচ্চার ছোট্ট ঠাণ্ডা নাকে চুমু খেয়ে বলল, "কিষ্ট, কিষ্ট !" 'কিষ্ট' ছোট্ট একটা লাল জিব দিয়ে ওর গাল চেটে দিল। নামটা বোধহয় তার বেশ পছন্দ।

এইভাবে কিষ্ট এসে দলে জুটল। বাঁদরদের সঙ্গে ওর ভারী ভাব। তারা হয়তো ওকেও বাঁদর ভাবত। এই প্রথম ওদের দলে একটা নিষ্কর্মা এল। পাকু বলত, 'বড় হলে কেমন পাহারা দেবে দেখিস্।' একটু একটু করে পায়ের হাড় জোড়া লাগল। কুঁই-কুঁই একটু করত বটে। কিন্তু হিমঘরের কলের ঘরঘরানি, রাস্তার কুকুরদের ডাকের উপর দিয়ে শোনা যেত না। মনাই বলত, 'পাকুদা, তুমি যদি আমার ঠ্যাংটা ওইরকম করে বেঁধে দিতে, তা হলে আমিও ন্যাংচাতাম না।' পাকু বলল, "ও-ও একটু ন্যাংচাবে রে। আর তুই তো কী সুন্দর হাতের কাজ করিস্। কত টাকা কামাস্। ন্যাংচালে কী ক্ষতি ?"

।। তিন ।।

প্রায় পাঁচ বছর আগে ওরা এই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিল। এতদিন নিশ্চিন্তে ছিল। এখানে একবার পৌঁছে গেলে মনে হত আর কোনও ভয় নেই। এখন কেন জানি মনে বড় অশান্তি হচ্ছে। তার উপর পাঁচরকম গুজব আসছে পাকুর কানে। বাকিদের কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। ওরা ভাবে হেন বিপদ নেই, যার থেকে পাকুদা ওদের উদ্ধার করতে পারবে না। পাকুদা ওদের সবাইকে পা রাখার জায়গা দেখিয়ে দিয়েছে। নইলে খালি দৌড় দৌড়। খালি ভাগ, ভাগ, হিঁয়া নেই, হুঁয়া নেই। মনে হত দুনিয়াতে কি একফালি জায়গা নেই, যেখানে পা রাখা যায়। যে জায়গা কারও নয়। যেখান থেকে কেউ ওদের চলে যেতে বলবে না। কতটুকু জায়গা লাগে একটা মানুষের ?

পাকু বলেছিল, 'আছে বইকী অনেক জায়গা। সেখানে পাখিরা জলার ধারে এক ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। মরা গাছের কোটর থেকে প্যাঁচারা ভুতুম-ভুতুম করে ডাকে। গাছের গায়ের আরও উঁচুতে গর্ত থেকে কাঠবেড়ালি নেমে আসে। সুড়ুত করে বড়-বড় গিরগিটি আর সবুজ সাপ ছুটে পালায়। এমন ঢের জায়গা আছে রে, যেখানে যাদের কেউ চায় না আর যাদের সবাই খুঁজছে, তারা আস্তানা করতে পারে। কিন্তু তার একটাতেও এই ঘেরা জায়গাটার মতো টুপ করে বেমালুম ডুব মারা যায় না।'

বটুক বলল, "তোমাকে তো কেউ ধরে নেবে না, পাকুদা। তোমাকে তো কেউ খুঁজে বেড়াচ্ছে না। আমার কথা, পানুর কথা আলাদা। আমাদের কেউ চিনতে পারলেই আর কথাটি নেই।"

পাকু অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকেও রে বটুক।" তারপর মাথা ঝেড়ে বলল, "বাজে কথা রাখ। কেন জানি মনে হচ্ছে শিগগিরি একটা কিছু হবে।"

ওরা তিনজন ছোট ছাপাখানায় কাজ করত। ভোলা, বটুক আর বলাই। যত রাজ্যের গুজব সবার আগে ওদের কানে পৌঁছত। বলাই হেসে বলল, "তা তো খুবই হতে পারে। ছাপাখানায় সবাই বলছে আমাদের এই কারখানাটা হয়তো আবার খুলতেও পারে। নাকি মামলা মিটে গেছে। অন্য লোকে জলের দরে যন্ত্রপাতিসুদ্ধ দশ বছর বন্ধ থাকা ছাপাখানাটা কিনে নিয়েছে। তবে ওসব যন্ত্রপাতি একে সেকেলে, তায় দশ বছর আলো হাওয়া লাগেনি। জং ধরে, মরচে পড়ে তার কি কিছু বাকি আছে ? ওসব পুরনো যন্ত্রের চলও উঠে যাচ্ছে। বোধহয় সের দরে বেচে দিয়ে, আর কিছু করবে। অনেকটা বাঁধানো মেঝে, পাকা ছাদ তো। কত কাজে লাগতে পারে।"

পাকু ভাবছিল, বলাইয়ের ভারী বুদ্ধি। যদি একটা ভাল জায়গায় কাজ পেত, তো ওর ভাল হত। ইচ্ছে করলে নৈশ-বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক দেওয়া যায়। পড়াতে পড়াতে পাকু যেমন নিজেও দিয়েছে। সে যাই হোক, শিগগির একটা কিছু সত্যিই হল। তবে বন্ধ ছাপাখানায় নয়। জাহাজ খালাসের জেটিতে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। হাতবোমা, মাথা-ফাটাফাটি, গোলাগুলি, ডাঙার পুলিশ আর নদী-পুলিশ একদিকে, মাল-খালাসিরা অন্য দিকে। দুই পক্ষই দুজনার হাতে বেজায় মার খাচ্ছিল। দোকানপাট ঝপাঝপ ঝাঁপ ফেলে দিল। এর পরেই তো লুটপাট। চোখ লাগাবার ফুটো দিয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। তাই বড়রা বটগাছটাতে চড়েছিল। সব মিটে গেলে তারা নেমে এসে পা থেকে কাঠপিপড়ে ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার, পুলিশ আর খালাসিরা যখন মারামারি করতে ব্যস্ত, তখন আসল মূর্তিমানরা কোত্থেকে বোমা হাতে মোটর চেপে এসে পিছন থেকে সবাইকে বেধড়ক পিটিয়ে বন্দুক কেড়ে নিয়ে, বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালাল, এ আমাদের স্বচক্ষে দেখা। শেষটা আরও মজার। ওই লোকগুলো পালালে পর লালবাজার থেকে কালো ভ্যান এল, অ্যাম্বুলেন্স এল। যারা মজা দেখছিল তাদের কালো ভ্যানে তোলা হল। যারা বেশি জখম শরীর নিয়ে পালাতে পারেনি, তাদের অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল। তারপর রাস্তা আবার ভোঁ-ভাঁ। আসল মজাটা কেউ বুঝতে পারল না।"

পাকুর ফরসা মুখে তার কপালের মধ্যিখানের কাটা দাগটা যেন কেমন অস্বাভাবিক রকম ফুটে উঠেছিল। কর্কশ গলায় সে বলল, "আসল মজাটা কী ?" হিংসার ব্যাপার দেখলেই বা তার কথা শুনলেই পাকু জানি কেমনধারা হয়ে যেত। গলাটা কেমন রাগত মনে হল।

ফিক্ করে হেসে বটুক বলল, "একটা সার্জেন্ট দুষ্কৃতকারীদের একজনকে ধরেই ফেলেছিল প্রায়। সে আমাদের গাছটার প্রায় তলা অবধি ছুটে এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, এই লম্বা একটা ছোরা বের করে সার্জেন্টের কাঁধের নীচে এক কোপ মেরে হাওয়া ! সার্জেন্টটা আর ট্যাঁ-ফোঁ না করে ওইখানেই পড়ে গেল।" এই বলে বটুক খুব হাসতে লাগল।

তার উল্টো ফল হল। লাফিয়ে উঠে পাকু বলল, "অ্যাঁ ! মরে গেছে !"

"কে জানে। যেতেও পারে। মোট কথা পড়ে আছে।"
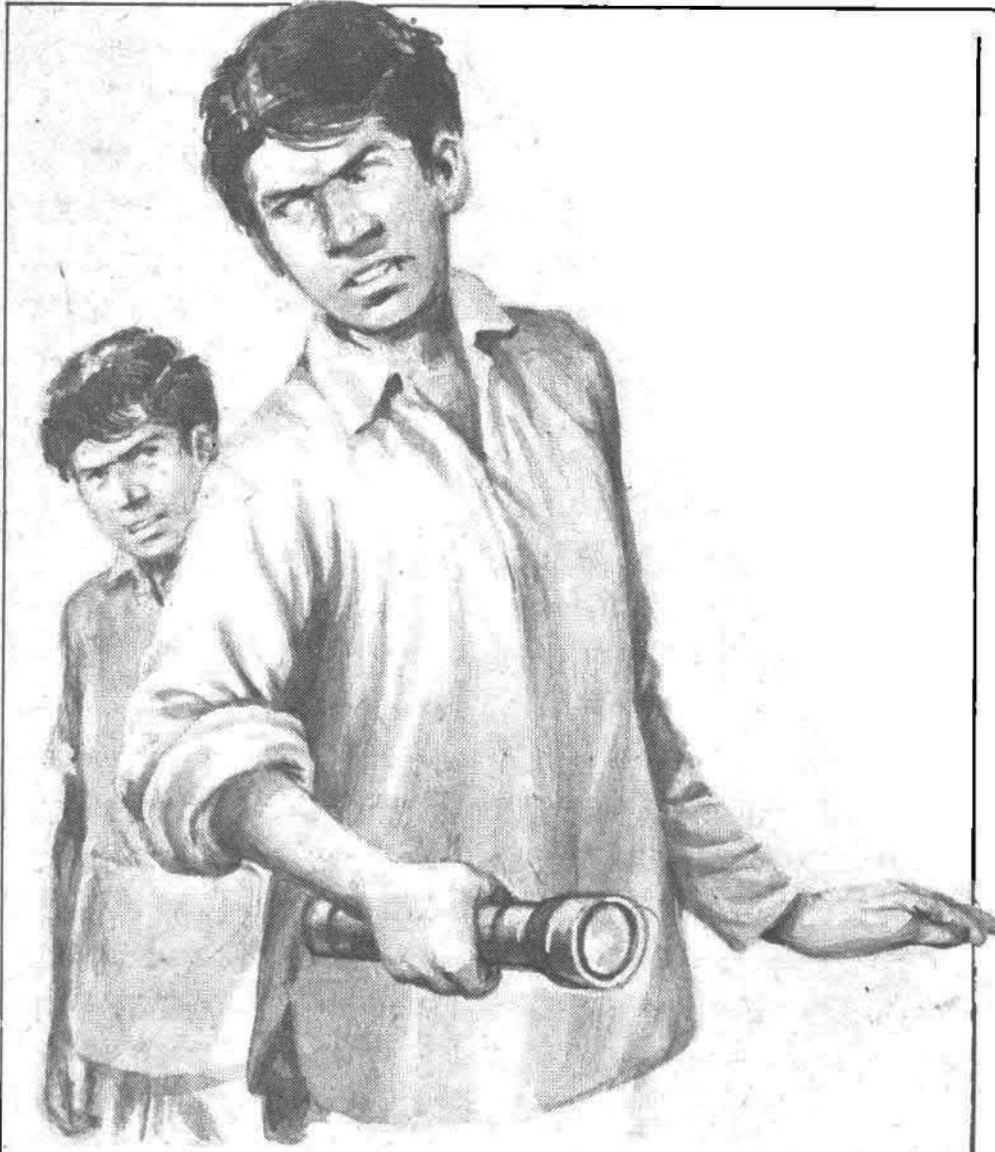
পাকু তার ছোট টর্চটা নিয়ে বলাই বটুককে বলল, "আমার সঙ্গে আয়।" ভোলাকে বলল, "দেখিস্ যেন আর কেউ না বেরোয়।"

মরার মতো পড়ে থাকলেও, একেবারে মরেনি। আস্তে-আস্তে নিশ্বাস পড়ছিল। পাকু বটুককে বলল, "তোদের ছাপাখানার মালিকের ঘরে ফোন আছে। লালবাজারে খবর দে। বলিস এ-পথ দিয়ে যেতে লোকটাকে দেখেছিস। আর কিছু বলিস না।" বটুক ছাপাখানায় যেতেই, খবর পেয়ে পাড়ার কিছু লোক এসে অকুস্থলে জড়ো হল। কাছেই রাস্তার কল থেকে আঁজলা-আঁজলা জল এনে লোকটার কপালে দিতে, একটু পরেই সে একটা কাঁপা-কাঁপা নিশ্বাস ফেলে, হঠাৎ চোখ খুলে পাকুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "তুমি কে ?" বলেই আবার অজ্ঞান।

লোকটার মুখের দিকে চেয়ে পাকু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন ভূত দেখেছে। দূরে অনেকগুলো গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠে বটুককে বলল, "লালবাজার থেকে আসছে ওরা। আর ভাবনা নেই। আমরা ভিড়ের পিছনে সরে দাঁড়াই। তারপর সরে পড়াই ভাল মনে হয়। নইলে এক্ষুনি কী নাম, কোথায় থাকি ইত্যাদি লিখে নেবে। এখানে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওদের হালচাল আমার জানা আছে।" একটু একটু করে সরতে সরতে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল আর ভিড়টা মজা দেখবার জন্য পুলিশের লোকদের ঘিরে দাঁড়াল। কেউ ওদের লক্ষ করল না। ওরা এসেই সবে বলতে শুরু করেছিল, 'কে ফোন করেছিল ? কোথা থেকে করেছিল ?' এমন সময় অজ্ঞান মানুষটির মুখের উপর আলো ফেলেই আঁতকে উঠল, "এ কী সব্বনাশ, স্যার নিজে !" আর ফোনের কথা কারও মনে রইল না। অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ডাক্তার ছিলেন। একবার দেখেই মুখ গম্ভীর করে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তে লেগে গেলেন। কারও কাছে কিছু শোনা হল না। একটু আগে মারপিট হয়ে গেছে, এটা তারা জেনেই এসেছিল।

অবশ্য শুনতে পেতও না কিছু। এই এলাকার কেউ কিছু ফাঁস করে না। সকলেরই কিছু না কিছু ঢাকবার আছে। পরিবার নিয়ে গেরস্তদের মতো থাকেও না কেউ। এটা একটা আলাদা জগৎ। কেউ কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। থানায় যেতে কেউ রাজি নয়। কথা জিজ্ঞাসা করলে বোকা সেজে থাকে। পরস্পরকে ঘাঁটায় না। সকলকেই বাঁচতে হবে তো।

নিঃশব্দে দুটো পাঁচিল টপকে নিজেদের ডেরায় ফিরে এসে বটুক একটা অদ্ভুত কথা বলল, "আচ্ছা, কারা বেশি খারাপ, পুলিশের লোকরা, না দুষ্কৃতকারীরা ?"

পাকু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তাই ভাবি।"

রোগা পানু লাফিয়ে উঠল, "নিশ্চয় পুলিশের লোকরা। তারা ভাল লোকদের ঠ্যাঙায় আর দুষ্টু লোকদের ছেড়ে দেয়। না, পাকুদা ?"

পাকু বলল, "কে জানে !" দলের লোকরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। পাকুদার আজ হল কী !

॥ চার ॥

ও পাড়ার লোকরা জানত না পাকুর আবার একটা দল আছে। দলের নিয়ম ছিল দুজনের বেশি একসঙ্গে কখনও দেখা দেবে না। ওরা কোথায় থাকে তাও কেউ জানত না। যে-পাড়ায় মেয়েরা থাকে না, কেউ ঘরকন্না করে না, রাস্তার উটকো ছেলেরা ছাড়া ছেলেপুলেও দেখা যায় না, সে-পাড়ায় কে কোথায় থাকে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সবাই এখানে-ওখানে, কর্মস্থানে, কি একটা গুদোম ভাড়া করে, কি কাছাকাছি কোনও বস্তিতে থাকে। সকলেই ধরে নিয়েছিল এরাও তাই করে। নৈশ-বিদ্যালয়েও পাঁচ জায়গা থেকে ছেলেরা পড়তে আসত। কেউ কারও বাড়ি যেত না। সকলেই সারাদিন কোথাও কাজ করত। বেশির ভাগই খুব একটা সুবিধের ছেলেও মনে হত না।

পাকু কখনও বলত না, 'তোমরা ভাল হও, ভাল করে পড়ে মানুষের মতো মানুষ হও, দেশের মুখ উজ্জ্বল করো !' খালি বলত 'আর যাই করো বাপু, পুলিশের হাতে পোড়ো না।'

'তবু যদি পুলিশে ধরে।'

'কোনও খারাপ কাজ কোরো না। যারা খারাপ কাজ করে, তাদের কাছ থেকে তফাতে থেকো। তা হলে পুলিশে ধরবে না। লেখাপড়া শিখলে বেশি রোজগার করতে পারবে, খারাপ কাজ করার দরকারও থাকবে না।'

সে-দিনের গণ্ডগোলের পর ওরা দশজন আরও সাবধান হয়ে গেল। একদিন ছোট-মনাই বলল, "যখন পুলিশ নিয়ে এই জায়গার মালিকরা আমাদের তাড়াতে আসবে, তখন আমি কী করে দৌড়ে পালাব ? আমার পা'টা যে খোঁড়া।"

পাকু হেসে বলল, "আমি তোকে কাঁধে তুলে লম্বা দেব। কেউ ধরতে পারবে না। জানিস, নাইট-স্কুলের মাস্টারমশাইদের দৌড়ে আমি প্রথম হয়েছি ?"

মনাই মহাখুশি। "তা হলে কিষ্টকে আমার কাঁধে তুলে নেব আর তুমি আমাকে নিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দেবে, না পাকুদা ?"

পাকু বলল, "নিশ্চয়।"

"কিন্তু যদি ফট্‌ফটিয়া চেপে তাড়া করে, তা হলে ?"

"তা হলে তোকে পিঠে বসিয়ে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে, কেউ কিছু বুঝবার আগেই ওপারে গিয়ে উঠব। কেউ খুঁজে পাবে না। কেনই বা খুঁজবে বল্ ? আমরা তো চুরি করিনি। জায়গা ছেড়ে চলে গেলে, কেউ কিছু বলবে না। বাঁদর রাস্তার বড়-বড় গাছে আরামে থাকবে। বনে কি তাদের ঘেরা জায়গা আছে ? হঠাৎ এসব মনে হচ্ছে কেন ?"

মনাই গলা নামিয়ে বলল, "শব্দ শুনেছি যে। তোমরা সবাই কাজে বেরিয়ে গেলে, ভজাদা আর আমি পষ্ট শুনলাম, ওই দেওয়ালটার পিছনে, বন্ধ ছাপাখানায় কারা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে।

ভজাদা বলল, ছোট পাঁচিল টপকে পাশের গুদোমের সরু জায়গায় লুকিয়ে থাকি চল্‌। নইলে আমাদের দুজনকে ধরে মিশনারি মেমদের কাছে দিয়ে দেবে। আর কোনওদিন তোমাদের দেখতে পাব না।" এই বলে ছোট-মনাই মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। এখানে চেঁচিয়ে কাঁদাও বারণ।

প্যাকু মনাইকে কাছে টেনে নিল। "কোনও ভাবনা নেই রে। কাল থেকে বড়দের কেউ তোদের সঙ্গে থাকবে। মধ্যিখানের দেয়ালে এতটুকু শব্দ শুনলেই ছোট পাঁচিল ডিঙিয়ে ওই পাশের জমিতে লুকিয়ে থাকলেই হবে। ওটা তো অন্য লোকের জায়গা।"

কথাটা ভাববার মতো বটে। ছাপাখানা বিক্রি হলে, দেয়ালের ওই দরজাটা খুলে নতুন মালিকরা এদিকে আসবে, তাতে সন্দেহ নেই। এসে কী দেখবে? একটা ঘেরা জায়গা, সেখানে কয়েকটা পথের ভিখিরি থাকে। তাদের তাড়িয়ে দিলেই হল। পথের ভিখিরি? এক পয়সা যারা কারও কাছে নেয় না, যাদের বাঁদররা পর্যন্ত রোজগার করে, তারা কী করে ভিখিরি হয়? পাকুর গলার মধ্যে একটা দলা পাকিয়ে এল, খুব ব্যথা করতে লাগল।

ছোট-মনাই ওর কানে কানে বলল, "বাঁদরদেরও নিয়ে যাব, না পাকুদা? ওদের ফেলে গেলে ওরা মনের দুঃখে মরে যাবে। বাঃ, নকুল যে আমার খোঁড়া পায়ে মাথা দিয়ে শোয়। ওর কষ্ট হবে না বুঝি? আমার মা থাকলে তাকেও নিয়ে যেতাম। জানো, ভজাদার মা ছিল একটা, সে নাকি কোথায় হারিয়ে গেছে। ভজাদা বেরোলেই তাকে খোঁজে।"

পাকু কর্কশ গলায় বলল, "থামবি কি না বল্‌? ছাপাখানায় কি তারা অনেকক্ষণ ছিল?"

"সারাদিন। কী সব সরাচ্ছিল।"

বটুক ভোলা ছোট ছাপাখানা থেকে ফিরে বলল, "কী কাণ্ড জানো না। ছাপাখানা তো নিলেম হয়ে গেছে। নাকি খালি জমির দরে বিক্রি হল। আমরা সবাই দেখতে গেলাম, বড় জায়গায় চাকরি পেলে বেশি টাকা দেবে ভেবে। আরে ছিঃ, ছিঃ! সব মরচে ধরে ধুরধুরে হয়ে আছে। বাইরের বড় তালাটা একটা ইঁট দিয়ে ঠুকতেই ভেঙে পড়ল। বাইরের দেওয়ালগুলো মোটা পাতের তৈরি বলে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি সব গেছে। তবে একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম। আমাদের এই দেওয়ালের এই বড় লোহার দরজাটা কেন দেখতে পেলাম না?"

ভোলা বলল, "কী মনে হল বলব? ঘরের এই মাথার হাত-তিনেক জায়গা ছেড়ে আরেকটা লোহার দেওয়াল তোলা হয়েছে। কেন কে জানে? নতুন মালিকের লোকরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। এ-দরজাটা তো ওদিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় আমাদের দিক দিয়েই ঢুকতে হয়। কেউ কিছু লুকিয়ে রেখেছে মনে হয়। যারা লুকিয়েছিল, তারা কোনও কারণে আর আসতে পারেনি। একবার দেখতে ইচ্ছে করে কী আছে ভিতরে। নেব না কিছু। খালি দেখব। কী বলো, পাকুদা?"

পাকু কোনও উত্তর না দিয়ে, আস্তে-আস্তে উঠে, কলের জলে ছেঁড়া গামছা ভিজিয়ে, দেওয়ালে আর নিজের হাতে আঁকা বুদ্ধদেবের ছবিটাকে ধুয়ে ফেলতে লেগে গেল। তার মুখ দেখে সকলে ভয়ে কাঠ। "কী সুন্দর ছবিটা, ধুয়ে ফেলছ পাকুদা?' আমাদের কোনও চিহ্ন না থাকাই ভাল। অনেকক্ষণ বুদ্ধদেবের মুখটি দেখা যাচ্ছিল। কয়েক ফোঁটা জল শেষ পর্যন্ত গাল বেয়ে নীচে পড়ল। পাকু সব কিছু সাফ করে দিল। কাষ্ঠহেসে বটুক বলল, "তুই আরেকবার তাঁকে কাঁদালি দেখছি।" আর সব চুপ।

॥ পাঁচ ॥

মুখে কিছু না বললেও পাকুর মনেও ওই একই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল। ভিতর থেকে ঢুকবার পথ নেই কেন? তার একমাত্র কারণ হল কাউকে এ-বিষয়ে কিছু জানতে না দেওয়া। কাউকে না জানিয়ে দেওয়াল তোলা কার পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয় মালিকের। অর্থাৎ মালিক কিছু লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু তার একার পক্ষে
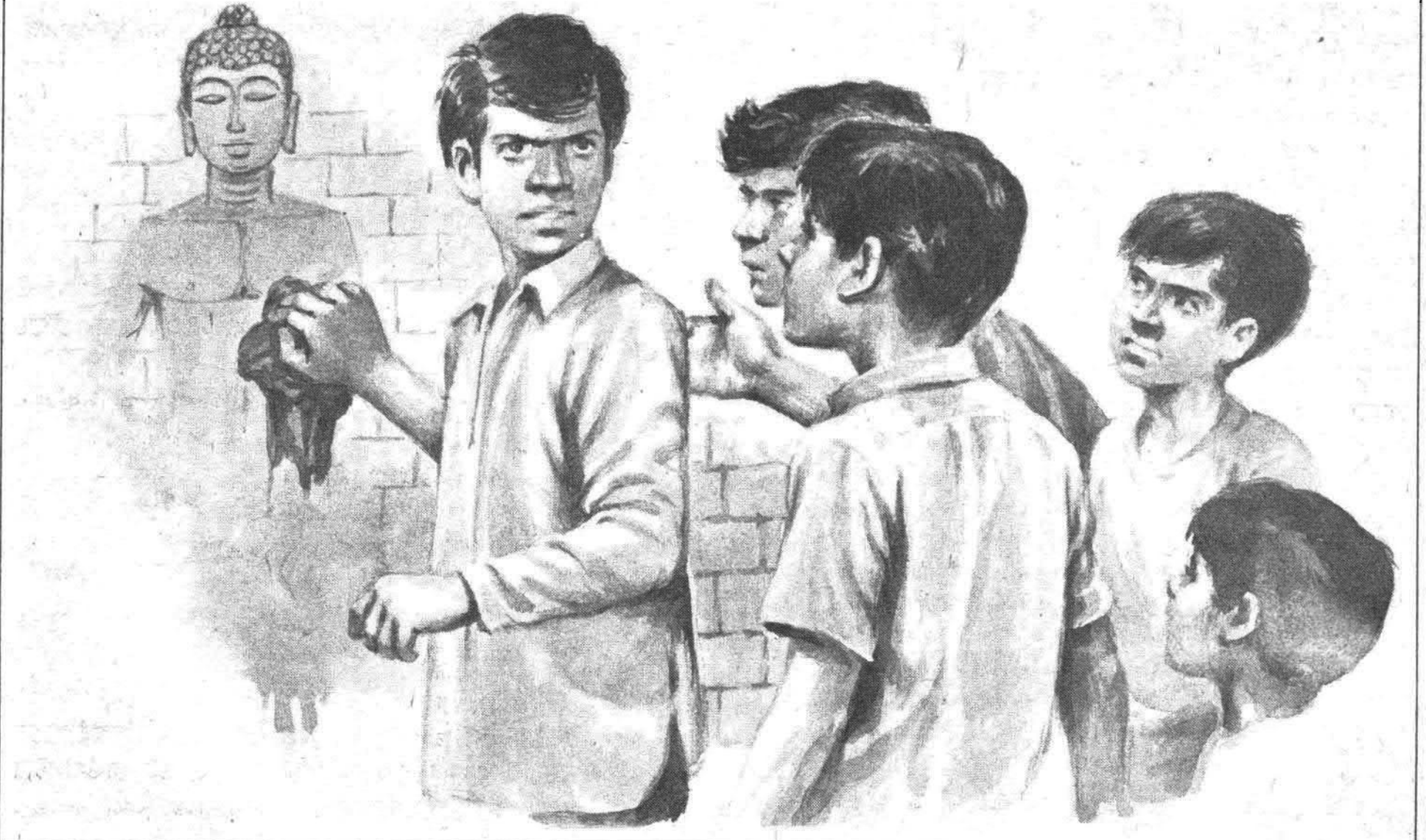
কিছু লুকিয়ে রাখা অসম্ভব ; সে তো বেজায় বুড়ো। দলে নিশ্চয় আরও লোক ছিল, আর কাজটা নিশ্চয় বেআইনি। তা হলে আদালত থেকে সদরে তালা দিয়ে গেলে পর, এই পিছন দিক দিয়ে লুকনো জিনিস বের করে নিয়ে যায়নি কেন ? তবে কি বেআইনি কিছু ? বমাল ধরা পড়ার ভয়ে সরাতে পারেনি ?

পাকুর চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। খালি মনে হতে লাগল, সব বেআইনি কাজই কি খারাপ ? আইন তো ভুল করে। পুলিশরা ঘুষ খায়। এ-কথা পাকু জানবে না তো কে জানবে ! সে মন ঠিক করে ফেল্‌ল। হোক বেআইনি, দুঃখী লোকদের সে সর্বদা সাহায্য করবে। বেআইনি কাজ করতে নয়, তার ফলে যদি পুলিশের হাতে পড়ার ভয় থাকে, তা হলেই করবে। খালি এপাশ-ওপাশ করছিল পাকু। মনে হচ্ছিল কাকে সাহায্য করতে হবে ? যাদের সাহায্য দরকার হতে পারে, এই পাঁচ বছর তাদের টিকির দেখা নেই কেন ? তাদের কি তবে জেলে পুরে রেখেছে, তবু বলেনি ? তারা হয়তো অন্য লোক, মালিকের দল নয়। আদালত থেকে তালা দিয়ে গেলে, এদিক দিয়ে ঢুকে, এই কম্মটি করেছে।

রোজ ভোরে গলি থেকে ট্রাকগুলো বেরিয়ে যায়। সারাদিন বাঁদররা পাহারা দেয় ; রাতে গলির দু'মাথায় সশস্ত্র গার্ড থাকে। ট্রাক রওনা হয়ে গেলে তাদেরও ছুটি হয়ে যায়। সেই সময় ট্রাকের শব্দ, কিছু হাঁকডাক হয়। এই হল ছাপাখানার পুরনো দেওয়ালের দরজা খোলার ঠিক সময়। বটুক, ভোলা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। বাঁদররা বটগাছে কিচিরমিচির করছে। পুব আকাশ ফিকে হয়ে গেছে। ঘেরা জায়গাতে কেউ আলো জ্বালে না।

ভোরের আলোতে পুরনো দেওয়ালের বড় ফটকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। নিঃশব্দে তিন-চারজনে গায়ের জোরে বারতিনেক ঠেলা দিতেই চড়চড় মড়মড় করে দরজার পাল্লা দুটো ভিতর দিকে খুলে গেল। বেশ খানিকটা ধুলো উড়ল, হাঁচি-কাসি, চোখ-জ্বালা। ধুলো উড়ে গেলে দেখা গেল সারি-সারি প্যাকিং-কেসের থাক। মধ্যিখানের দেয়ালের সবটা জুড়ে, একটার উপর একটা সাজানো। পুরনো কাঁচা কাঠের তৈরি, কোথাও ছ্যাতলা পড়েছে, কোথাও ছোট্ট-ছোট্ট ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে।

বটুকদের গোড়ায় ব্যাপার দেখে মজা লাগছিল। কিন্তু পাকুর মুখ সাদা হয়ে গেল, "ওরে, আমাদের ছিনতাইকারী ঠাওরাবে না তো ?"

বটুক চমকে উঠলেও ভোলা হেসে বলল, "আট-ন' বছর পড়ে না থাকলে এগুলোর এমন হাল হতে পারত না। আমরা আছি মাত্র চার-পাঁচ বছর।" আস্তে-আস্তে দরজাটাকে ঠেলল।

ভাগ্যিস ছোটদের ঘুম ভাঙেনি, নইলে তাদেরই উৎসাহের চোটে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। কী করা যায় ভেবেই পাকু সারা। দশজন ওরা। পাকু ছাড়া বটুক, ভোলা, বলাই ছাপাখানায় কাজ করে। মাধু, প্যাণ্ডা, ভুতো জুতো-পালিশ, কাগজ-বিক্রি এইসব করে। ভয়ঙ্কর গায়ে জোর ওদের। ডনবৈঠক করে। ওদের জন্য পাকুর বড় ভয়। সুখের বিষয় শরীরে রাগ নেই ওদের। খিদিরপুরের দিকে মণিবাবুর জিমনেশিয়াম আছে, সেখানে তাঁর শাকরেদি করে। সেবার বন্যার সময় তিনটেকে একসঙ্গে বাঁধের উপর থেকে তুলে এনেছিল এরা। কেউ আছে বলে মনে হয়নি। পাকুদার কথায় ওঠে বসে। রোগা পানুর শরীর দুর্বল, পড়াশুনায় খুব মন। দিন-রাত পড়ে। নাইট-স্কুলের সকলে বলে একদিন ও-ই হেডমাস্টার হবে। এখন মোটে বারো বছর বয়স। সবার ছোট ভজা আর মনাই। তারা বড় একটা বাইরে যায় না। পাকুর কাছে পড়ে আর কাঠকয়লা, গেরিমাটি, খড়ি এই সব নিয়ে ডালায় কুলোয় হাতপাখায় চমৎকার নকশা তোলে। মনাই কাঁথার কাজ করে। কেউ শেখায়নি। একটা ছেঁড়া কাঁথা দেখে শিখেছে। ওদের যা-যা দরকার, সব পাকু কিনে এনে দেয়।

হুট করে এখান থেকে দশজনে যাবে কোথায় ? অবশ্য গঙ্গার ধারে ধারে আরও অনেকটা এগিয়ে গেলে কয়েকটা সেকালের পোড়ো বাড়ি আছে, সবাই বলে ভূতের বাড়ি। দিনের বেলাও কেউ যায় না। কী সুন্দর জায়গা সে-সব। কিন্তু সেখানে গেলে সকলের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে, স্কুলে পড়াও হবে না। যে নিজে খেটে খেতে পারে না, তাদের যে কেউ সাহায্য করে না, এটা পাকুর ভাল করেই জানা ছিল। কিন্তু ওই বাক্সগুলো দেখে অবধি সব গোলমাল লাগছিল।

সারাদিন কাজে মন বসল না। বড়-মুদির দোকানে পাকু শনিবার শনিবার হপ্তার হিসেব মিলিয়ে দিত। সে এক ব্যাপার। একটা খোঁচামতো জিনিসে কুচিকুচি কাগজে দেনা-পাওনার হিসেব লিখে ফুটিয়ে রাখার কথা। তার অর্ধেক লেখা থাকে, অর্ধেক মুদি মুখে মুখে বলে। ক্যাশবাক্স বের করে সামনে ফেলে দেয়, "মিলিয়ে দাও, পাকুবাবা, আমার কিছু ঠিক থাকে না।"

পাকুর ভারী বুদ্ধি, কতক আন্দাজে কতক হিসেব দেখে, মোটামুটি একটা তৈরি করে দেয়। আজ কিছু ভাল লাগছিল না। মুদি ব্যস্ত হয়ে বলল, "কিছু ঘটিয়েছ নাকি, পাকুবাবা ?"

পাকু চমকে উঠে বলল, "অ্যাঁ ? না, না, একটু মাথা ধরেছে।"

মুদি বলল, "ওইসব পাখা ডালি কুলোয় নকশা করিয়ে দিলে, কাঁথাটা সিলিয়ে দিলে, তার হিসাবও লিখলে না, পয়সাও নিলে না। এই দ্যাখো, আমি ঠিক করে রেখিয়েছি। নিয়ে যাও, মন ভাল হবে। বড় ভাল কাজ।" পঞ্চাশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে, পিঠে হাত রেখে মুদি বলল, "কুছু বিপদ আপদ হলে আমাকে বোলো, বাবা।"

পাকু বলল, "নিশ্চয় বলব।" মনটা আবার ভাল হয়ে গেল। মুদিকে সবাই কিপ্টে কঞ্জুষ বলে।

ঘেরা জায়গায় ফিরে এসে পাকু ভজা, মনাইকে খুশি করে দিল। "এই দ্যাখ্, তোদের টাকা দিয়ে সকলের জন্য কচুরি জিলিপি এনেছি। আরও এত্ত টাকা বাকি আছে।"

কিষ্ট-ও একটা গোটা জিলিপি খেয়ে ফেলল। এমন সময় একে একে বলাই, বটুক, ভোলা এসে হাজির, "ওঃ ! তোমার নাম এবার কাগজে না বেরোয় ! একজন ভদ্রলোক এসে জানতে চাইছিল, কপালে তিলকের মতো দাগ সে-ছেলের নাম কী, কোথায় থাকে।"

আর সকলে হেসে বাঁচে না। কিন্তু মনে হল কে যেন ভিজে গামছা দিয়ে পাকুর মুখ থেকে সব হাসিখুশি মুছে নিল। সে বলল, "তোমরা কী বললে ?"

"কী আবার বলব ? বললাম, কার কপালে তিলকের মতো দাগ ? কই আমরা তো দেখিনি।"

ভোলা হেসে বলল, "ছাপাখানার মালিকও অবাক হয়ে ভদ্রলোককে বললেন—দেখতেই তো পাচ্ছেন এখানে ওরকম কেউ নেই। একটু ঘুরেঘারে দেখুন। কেন, সে দুষ্কৃতকারীটারি নাকি ? তাদের সঙ্গে আমাদের কী ? ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না, না, একেবারেই তা নয়। তার সঙ্গে অন্য দরকার ছিল। এই বলে যেন হতাশ হয়ে চলে গেলেন।"

পাকু কোনও কথা বলল না। রাতে সকলে শুয়ে পড়লে বটুক, ভোলা, বলাইকে ডেকে বলল, "ব্যাপারটার পিছনে আর কিছু আছে। কী করা উচিত ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। এখান থেকে যে চলে যেতে হবে, সেটা ওই প্যাকিং-কেস দেখে অবধি বুঝেছি।"

বলাই বলল, "বোমা বারুদ গোলাগুলি হিংসাত্মক দ্রব্যাদি নাকি ? দেখব একবার ?"

"সেজন্য নয়। ওগুলো ছুঁবি না। ছ্যাতলা আর ব্যাঙের ছাতা

আমাদের প্রমাণ।"

"সত্যি করে বল্ পাকু, কোনও দিনও কোনও দুষ্কর্ম করে ফেলে সেই ইস্তক, গা-ঢাকা দিয়ে আছিস্ নাকি?"

পাকু বলল, "গা-ঢাকা দিয়ে আছি ঠিকই, তবে দুষ্কর্ম নয় সৎকর্ম করে। সে তোদের শুনে লাভ নেই। এখন এই ছেলেগুলোকে নিয়ে কোথায় যাব?"

ঘুম-জড়ানো স্বরে মনাই বলল, "ছেলেগুলো আর বাঁদরদের নিয়ে।"

বড়রা চারজন চুপ। ঝড়ে উড়ে-আসা একঝাঁক পাখি একটা গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছিল, তা ছাড়া কী?

।। ছয় ।।

রাতে কে কতখানি ঘুমোল বলা মুশ্‌কিল। ভোরে উঠেই পাকু ছোট-মনাইয়ের চুল নেড়ে দিয়ে বলল, "দশটা ছেলে পাঁচটা বাঁদর যেখানেই থাকি, একসঙ্গে থাকব। তোর কোনও ভয় নেই। আজ রবিবার, এ-বেলাটা আমাকে কিছু ঘোরাঘুরি করতে হবে। তোরা বরং নাই বেরোলি। মনে আছে তো আমাদের নিয়ম? হুট্ করে চলে গেলেও, কোনও চিহ্ন রেখে যাবি না। যার যার জিনিস নিজের থলিতে ভরা থাকবে। দরকার হলেই থলি কাঁধে রওনা।" হাসল পাকু।

আজ সকালে তাকে দেখে বলাইয়ের মনে হচ্ছিল, সে একটা দুস্তর সমুদ্দুর পার হয়ে কূল পেয়েছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস হল না। হয়তো সমবয়সী, তবু কেমন যেন অনেক বড়। বটুক হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে একটা খুদে কার্ড বের করল, "আরে এটার কথা মনেই ছিল না। কালকের সেই ভদ্রলোক আমাদের মালিককে দিয়েছিলেন। আমি নিয়ে এলাম। কী জানি যদি কাজে লাগে। বলা তো যায় না।"

কার্ডে লেখা এম· রায়, নীচে তালতলার একটা ঠিকানা। পাকু একবার তাকিয়ে দেখে, সেটি পকেটে ভরল। বটুক একটু উশ্‌খুশ্ করে বলল, "হ্যাঁ রে পাকু, ওই প্যাকিং-কেসে যদি সত্যি বোমা, বিস্ফোরক থাকে? সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে রেখেছে। ঠাট্টা নয়, পুলিশ তো ভাবতে পারে আমাদের কাজ।"

ভোলা হাসল, "আমরা না ছুঁলে, যে দেখবে সে-ই বুঝবে বহু বছর আগেকার জমানো মাল। মাকড়সার জাল, ছ্যাতলা, ব্যাঙের ছাতার বাহার দেখেছিস তো। বিপদ সেখানে নয়।"

"তবে কোথায়?"

"শুনেছি ঠোকাঠুকি ঠেলাঠেলির ফলেও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। অবিশ্যি ৫-৬ বছর ধরে স্যাঁতসেঁতে বন্ধ ঘরে থেকে ওসব জিনিসও সম্ভবত নিরামিষ হয়ে গেছে। পাকু কেন চুপ? বুদ্ধি দে।"

পাকু বলল, "ভাবছিলাম মনাইয়ের ঠ্যাংটা ডাক্তাররা নিশ্চয় ঠিক করে দিতে পারে।"

মনাই খুশি হয়ে উঠল, "অ্যাঁ! তাই নাকি? তখন আমিও দৌড়ব! কিষ্টর ঠ্যাংও সারিয়ে দেবে পাকুদা? সে আমার পিছন পিছন দৌড়বে না?"

পাকু বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। মনে থাকে যেন, যে যতই বলুক আমি না ফেরা অবধি কেউ কোথাও যাবি না। পুলিশের লোকরা এলেও না। আমি এসে যা হয় একটা ব্যবস্থা করব। ওরে পানু, বড় মুদিকে বলা আছে, এক কেটলি চা এক ঠোঙা বিস্কুট আর বারোটা মাটির ভাঁড় নিয়ে আসিস্। আমার একটু দেরি হতে পারে। আজ আমগাছটাতে ঝাঁকা দিয়ে আম নামালে দোষ হবে না।" এই বলে আমগাছে দুটো ঝাঁকি দিয়ে চার-পাঁচটে পাকা আম ফেলে, পাঁচিল টপকে পাকু হাওয়া।

বটুক বলল, "কর্তার এত ফুর্তি আমার পছন্দ হচ্ছে না। একটা কিছু মতলব ফেঁদেছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাদের বাদ দিচ্ছে কেন? ফলো করব নাকি?"

বলাই আশ্চর্য হয়ে গেল, "বেরোতে মানা করেছে, শুনলি না?"

বটুক আবার ধপ্ করে বসে পড়ল। বাঁদররা ভোরে বটগাছে ঝুলোঝুলি করছে। এখানকার ট্রাকওয়ালাদের শনি-রবি বলে কিছু নেই। পানু চা-বিস্কুট আনল, গাছে নাড়া দিতেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে গোটা-কুড়ি আম পড়ল। কিষ্টও আম খায়, কুকুররা মিষ্টি আম খুব ভালবাসে। আঁটি চোষে। বসে বসে তাই দেখে ওরা। চা-বিস্কুট খায়। স্কুলের পড়া করে। মনাইকে পড়ায়। ঝাঁটপাট দেয়। তবু সময় কাটতে চায় না।

এদিকে তালতলার সেই ঠিকানায় পাকু গিয়ে পৌঁছেছে। অন্যান্য পাঁচটা বাড়ির মতো সবুজ লোহার রেলিং ঘেরা, দোতলা একটা মাঝারি মাপের বাড়ি। ফটক দিয়ে ঢুকেই একটা কাঁকর-ফেলা পথ। তার অন্য মাথায় গ্যারাজ। বাঁ দিকে ছোট বারান্দার ওপর সদর দরজা হাট করে খোলা। একজন ভালমানুষ চেহারার লোক হাফশার্ট আর পেন্টেলুন পরে, সিঁড়ির ওপর বসে ছিল। পাকুকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে এম· রায় লেখা কাগজটা দেখাতেই, একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটা। মনে হল বাজপাখির মতো দৃষ্টি, 'তা চেহারা যাই হোক। তা ছাড়া প্যান্টের ডান পকেট ফুলো। পাকুর কাছে এ কিছু নতুন নয়।

এদিকে ততক্ষণে ঘেরা জায়গায় ন'টা ছেলে একটা কুকুর একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ উঁচু পাঁচিলের বাইরে হট্টগোল। দেখতে-দেখতে লম্বা-লম্বা মইয়ের মাথা দেখা গেল। এই রে! হয় সেই ছিনতাইকারীরা, যারা প্যাকিং-কেস্ লুকিয়েছিল, নয় পুলিশ! ইশ, সঙ্গে-সঙ্গে জানাজানি হয়ে গেল! বলে না বাতাসেরও কান আছে! মোট কথা, ছোটগুলো একটু ঘাবড়ে গেছিল। বলাই ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে পাশের গুদোমের সরু জায়গাটা দেখিয়ে দিল। আসলে পাখি-পড়া হয়েই ছিল সবাই। মুহূর্তের মধ্যে নিঃশব্দে, যে যার থলি কাঁধে, নিচু পাঁচিল টপকে পাশের বাড়ির সরু জায়গাতে অদৃশ্য হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, ছোট-মনাই, কিষ্ট-বগলে, ভোলার কাঁধে চেপে।

সেখানকার ঝোপের আড়াল থেকে যেই না দেখল জনাকুড়ি মিস্ত্রি ধরনের লোক, শাবল, গাঁইতি-হাতুড়ি নিয়ে উঠে আসছে, অমনি এরাও আমগাছের পিছনে নিচু পাঁচিল টপকে পথের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল। আহা, গা-ঢাকা দেবার জন্য ভিড়ের মতো কিছু আছে কি? মাথার ওপর খোলা আকাশ, কোথাও কোনও বেড়ার বাধা নেই, চেনা-অচেনা একাকার হয়ে থাকা, সে যেন স্বর্গ! ধরে কার সাধ্যি।

বাইরে থেকে দেখলে ঘেরা জায়গাটাকে অন্যরকম লাগে। ছাপাখানার মালিক বলাই, বটুক, ভোলাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "দ্যাখো, কাণ্ড দ্যাখো! নতুন মালিকের ঠিকাদাররা সরেজমিনে মেপে, নকশার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে নাকি দেখছে ছাপাখানার বাইরের মাপের সঙ্গে ভেতরের মাপ মিলছে না! এমন আজগুবি কথা কেউ শুনেছে কখনও? মিলবে না তো কি টেলিস্কোপের মতো একটার ভেতর আরেকটা ঢুকে থাকবে। ওইসব চাকতির মধ্যে থেকে ফিতে টেনে মাপলে কখনও হিসাব মেলে? ছোটবেলায় দেশে দেখেছি, লাঠি দিয়ে মাপে আর সুর করে বলে, এলোয়া বেওড়ি তেলোয়া চৌরি, পঞ্চে জেদ সুদে! বলি সাতের মাপ না হলে কখনও মাপ ঠিক হয়? তাই দুনিয়া জুড়ে সাত দিনে সপ্তাহ। কী বলো, বাবা বটুক?"

বটুক বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়!" এক্ষুনি কিছু শুনবে বলে তার দু' কান খাড়া।

বলাই সবে বলেছে, 'নতুন মালিক এখানে কী করবেন? ঝুরঝুরে

যন্ত্রপাতি তো সব সাফ করিয়েছেন।' ছাপাখানার মালিক বললেন, "খ্যাপা না হলে না দেখে না শুনে এমনি কিনে বসে থাকে? এ-জায়গাটা ভাল না। রাতে কেউ এদিকে আসে না। কারা নাকি পাঁচিলের ভিতরে চলাফেরা করে। অনেকে শুনেছে। অথচ সেখানে যাওয়া-আসার পথ নেই! কারও কথা শুনল না বুড়ো। নাকি তার নাতির নামে কারিগরি বিদ্যালয় হবে। সব ভেঙে ফেলে দোতলা পাকা বাড়ি হবে। নীচে তাঁত বসবে, প্রেস বসবে, ছুতোরের কাজ শেখানো হবে। দোতলায় যাদের বাড়িঘর নেই, তারা থাকবে। বড়লোকের খেয়াল, বুঝলে না। তবে খেয়ালটা ভাল। ও কী?"

হঠাৎ একটা দুদ্দাড় শব্দ, যারা শাবল-গাঁইতি নিয়ে ঢুকেছিল, তারা আবার বেরিয়ে আসতে লাগল। কী? না, ও বাবা, বোমা-বারুদ ইস্টক করা আছে। ছুঁয়েছে কি ফেটেফুটে একাকার! তাই শুনে ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ মই বেয়ে উঁচু পাঁচিলে চাপল মজা দেখতে। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে মাধু আর ভুতো প্যাঙাও ছিল। বাকিরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওদের টেনে নামাবার চেষ্টা করলেই ভিড়ের নজরে পড়ে যেতে হবে। সবাই বলবে, 'তোমাদের অত মাথাব্যথা কিসের, বাপু? তোমাদের প্যাকিং-কেস?' বলেছি তো বলাই বেজায় বুদ্ধিমান। সে গোলে-হরিবোলে নিচু পাঁচিল থেকে আমগাছে চড়ে বসল। বাকিরাও একে একে উঠল। ভোলার সঙ্গে কিষ্ট-কাঁধে মনাই পর্যন্ত।

ভাগ্যিস চড়েছিল, তাই চমৎকার এক দৃশ্য দেখতে পেল। ততক্ষণে খবর পেয়ে ঠিকাদারমশাই সম্ভবত পুলিশের কোনও বিশেষ বিভাগ থেকে অদ্ভুত চেহারার সব যন্ত্রপাতিসহ একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে হাজির হলেন। তাঁদের কাজই হল বিস্ফোরক জাতীয় সন্দেহজনক কিছু দেখলে তাকে একেবারে নিরামিষ করে দেওয়া। দুঃখের বিষয় আমগাছ থেকে সবটা দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল কারণ ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল আর ভিড়ের লোকরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, "ওই দ্যাখ, কী সাহস! প্রাণ হাতে করে সব ঢুকে পড়ছে। একজনও ফিরবে না, এই আমরা বলে দিলাম!" তারপর কিছু ঠুসঠাস ভুসভুস অদ্ভুত শব্দ। তারপর চড়চড় করে একটা প্যাকিং-কেস খুলতেই 'ও-ও-ও-ও' করে কারা ডাক ছাড়ল।

ভিড় ব্যস্ত হয়ে উঠল, "কী হল? কী হল?"

ঠিকাদারমশাই হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বেরিয়ে এলেন।

"ও মশাই, বাক্সে কী? মড়াটড়া নাকি?"

ঠিকাদার হেসে ফেললেন, "একেবারেই না। সম্ভবত জাহাজঘাটা থেকে সরানো চোরাই-মাল। তবে মালিক ভিতরকার জিনিসপত্রসহ বাড়ি কিনেছেন, কাজেই এসব এখন তাঁর সম্পত্তি। আমি এ-দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিচ্ছি। মধ্যিখানের দেওয়ালটা খুলে ফেলা হচ্ছে। বাইরের দরজায় বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা বসিয়ে যাচ্ছি।"

"আহা খুলেই বলুন না। সোনা-রুপো-হিরে-মুক্তো গয়নাগাটি, তোড়াতোড়া মোহর নাকি?"

"মোটেই না, মোটেই না!"

"তবে কি আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র, গুলিগোলা, বন্দুক, মেশিনগান? আহা শুনেও সুখ পাই।"

"আরে না, না! খালি গোছাগোছা হাজার টাকার নোট। সব অচল। সম্ভবত জাল। তা ছাড়া উইধরা, ছ্যাতলা পড়া!"

সবাই বলল, "ছি, ছি! দুয়ো, দুয়ো।"

॥ সাত ॥

সেই লোকটি কোনও কথা না বলে পাকুকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল। এম· রায়ের পড়ার ঘরে ঢুকে পাকু বলল, "মণিজ্যাঠা, আমি এসেছি। আমাকে আর খুঁজে বেড়াতে হবে না। আমাকে ধরো।" এই বলে গুপ্তদলের নাটের গুরু পাকু দু'হাতে মুখ ঢাকল। তারপর হাত নামিয়ে বলল, "কাঁদতেও ভুলে গেছি, মণিজ্যাঠা।"

মণিজ্যাঠা রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছতে নাক ঝাড়তে ব্যস্ত ছিলেন বলে তক্ষুনি কিছু বলতে পারেননি। তারপর রেগে বললেন, "হতভাগা রাস্‌কেল ! কিসের জন্য ধরব তোকে ? বাড়িসুদ্ধু সক্কলকে কাঁদিয়েছিস্ বলে ? ওঃ, কী আমার দয়ার শরীর রে । বাপ বন-পায়রা শিকার করলে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে । চোর ধরলে তার দুঃখে গলে গিয়ে ছেড়ে দেয় ! পেটালে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আর ফেরে না । বাপ হন্যে হয়ে খুঁজে-খুঁজেও টিকির ডগার হদিস পায় না । হতভাগী মা'টার কথাও মনে হল না, কোথায় ছিলি ?"

পাকু গুটিগুটি কাছে গিয়ে মণিজ্যাঠার বুকে আছড়ে পড়ে বলল, "কাকু বলেছে কিছু ?"

মণিজ্যাঠা বললেন, "সে তো হাসপাতালে পড়ে আছে । খালি বলছে তোকে দেখেছে । ভাবলাম ভুল বকছে । কেন পালালি আগে তাই বল্ ।"

মণিজ্যাঠার পাশে বসে এই প্রথম পাকু তার মনের কথা খুলে বলল । পাঁচ বছর আগে থানায় বাবাকে তুলতে এসে শুনেছিল যে, কমলালেবু চুরি করার জন্য ওর বয়সী একটা ছেলে লক্-আপে আছে । লেবুর মালিক মাল ফেরত পেয়েছিল বলে চোরের হাল্কা সাজা কুড়িটা বেত । ছেলেটা দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল । রোগা টিঙটিঙে, এই বড়-বড় চোখ । পাকু কাছে যেতেই বলল, তার ঠাকুমা জ্বরে বেহুঁশ, তাই দুটো লেবু তার জন্য নিয়েছিল । কিনবার পয়সা নেই । পাকু দরজার তালা খুলে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল । বাবা তখন থানার ও· সি· । ভীষণ রেগে সেই কুড়িটা বেত ওকে মারবার হুকুম দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে গেছিলেন । বেত খেয়ে ও আর বাড়ি ফেরেনি ।

মণিজ্যাঠা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কুড়িটা বেতের বাড়ির জন্য সাড়ে পাঁচ বছর নিখোঁজ হলি ? কী আশ্চর্য ! তুই না লড়াই করতে যাবি ?"

"তাই তো গেলাম ।"

তারপর একটু একটু করে, সব কথা মণিজ্যাঠা টেনে বের করে তাজ্জব বনে গেলেন । সবচেয়ে অবাক হলেন এমন বেমালুম গা-ঢাকা দিয়ে দশটা দুঃখী ছেলের কী করে থাকা সম্ভব ? কাকুর কথা শুনে সাদা পোশাকে ওই অঞ্চলটা মণিজ্যাঠার গুপ্তগোয়েন্দারা গোরু-খোঁজা করেও কিছু পায়নি ।

এবার চমকে উঠে পাকু বলল, "সবাই আমাকে পাকু বলে জানে ও-পাড়ায়, বোধহয় তাই পায়নি । সেই ছেলেটা কিন্তু তার ঠাকুমা মারা গেলে খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে পৌঁছেছিল । তার নাম বটুক, এখন সে অন্যরকম ।"

"এবার বল, আজ কেন নিজের থেকেই এলি ?"

কেন এল, তা ঠিক বলতে পারল না পাকু, ওই শেডে প্যাকিং-কেসগুলো দেখে মনে হয়েছিল, যদি বিস্ফোরণ হয় ? তা হলে অনেক নির্দোষ লোকের ক্ষতি হবে । নিষ্ঠুরদের সঙ্গে লড়তে হলে, ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থেকে হবে না ।

মণিজ্যাঠা বললেন, "তা হলে লেখাপড়া না শিখে, মা-বাপকে কাঁদিয়ে, সাড়ে পাঁচটা বছর জলে ফেলে দিলি বল ?"

পাকু মাথা নাড়ল, "না, জলে ফেলে দিইনি, ন'টা ছেলে পা রাখার জায়গা পেয়েছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে । তাকে তুমি জলে ফেলে দেওয়া বলো ? তা ছাড়া নাইট-স্কুল থেকে এবার উচ্চ-মাধ্যমিক দেব । আসছে বছর আরও তিনজন মাধ্যমিক দেবে । এ-সব কি কিছু নয় ? জানো, আমাদের পাঁচটা বাঁদর পাহারাওয়ালার কাজ করে···হাসছ কেন ?" পাকু মণিজ্যাঠার হৃদয়হীনতা দেখে চটে গেল, "এ-সব গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে তোমার মজা লাগছে ?"

মণিজ্যাঠা চোখ মুছে বললেন, "মজা নয় রে, আনন্দ লাগছে। আনন্দে লোকে হাসে না ?" এই বলে কেঁদে ফেললেন ।

এর অনেক পরে গোটা-দুই গাড়ি করে যখন পাকু···আর পাকু কেন, ওর আসল নাম সায়ন রায়। মা, বাবা,ছোট ভাই সুমন, মণিজ্যাঠা এবং আরও চার-পাঁচজন, যাদের মধ্যে ট্রাক-ড্রাইভারদের সরদারের মতো দেখতে একজনও ছিল, সকলে মিলে ঘেরা-জায়গার সামনে পৌঁছল । যদিও ওটা আসলে পেছন দিকই বলতে হবে ।

ঠিক সেই সময়ে 'দুত্তেরি ছাই' 'যাচ্চলে' এই সব বলতে বলতে পাঁচিলের ভিড়টা খচমচ করে মই বেয়ে নেমে আসছিল, আর আমগাছ থেকে ঝপাঝপ করে পাকুর দল অবতরণ করছিল । গোদা, ভোঁদা, নকুল ইত্যাদি বাঁদররাও একটা কিছু হতে যাচ্ছে সন্দ করে, পাহারার কাজ ফেলে এসে হাজির । সরদারের মতো দেখতে লোকটাকে দেখে তাদের কী ফুর্তি ! অমনি ছুটে কাছে এসেছে । সে-ও পকেট থেকে পেপারমিন্ট বের করে সবার হাতে দিয়েছে । পাকু গিয়ে বটুকদের ডেকে আনল । তারা সরে দাঁড়িয়েছিল । বাবা বটুককে দেখে বললেন, "বাঃ, এই তো মানুষের মতো মানুষ হয়েছ । সেদিন সন্ধ্যায় খুব খারাপ কাজ করিনি আমরা তা হলে ? কিন্তু ঘেরা-জায়গায় তো সারি-সারি কলঘর বসবে শুনেছি । এদের থাকার কী ব্যবস্থা হবে ?"

পাকু বলল, "তুমি ভেবো না, বাবা । আমরা কিছু ব্যবস্থা করে নেব ।"

মনাই তার হাত ধরে বলল, "নকুল, কিষ্ট আর আমি তোমার সঙ্গে থাকব ভূতের বাড়িতে, না পাকুদা ?"

এইবার পাকুর মা এক কাণ্ড করলেন । হঠাৎ এগিয়ে এসে বললেন, "দশটা ছেলে, পাঁচটা বাঁদর আর কিষ্ট সবাই আমার সঙ্গে থাকবে । বাবা তো ছোট বাড়িটাও কিনেছেন । কাছের গোড়ায় থেকে, সবাই মিলে না খাটলে কখনও আবাসিক কারিগরি বিদ্যালয় গড়ে তোলা যায় ?" বলে হাসতে লাগলেন ।

অমনি ভজা ছুটে এল, "আমার সেই মা'টাও তো এইরকম হাসত । তুমিই নাকি ?"

"আরে হ্যাঁ রে, হ্যাঁ ! আমিই বটে !"

পাশের ছোট বাড়িটা দেখে বলাইয়ের খটকা লাগল । যেন আগের থেকেই ওদের জন্য রাখা । পাকু একজন বুড়ো ভদ্রলোককে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে বলল, "জানিস, এই আমার দাদামশাই । উনি খুব ভাল মানুষ । আমাদের সব কথা দাদামশাই জানতেন । ট্রাক সরদার ওঁর লোক । সে রোজ সব রিপোর্ট করত । কিন্তু দাদু কাউকে বলেননি । বাবা, মণিজ্যাঠা, ছোটকাকু সকলেই পুলিশের লোক । আমার চলে যাওয়া নিয়ে রাগমাগ করে দাদু ওঁদের মুখ দেখা বন্ধ করেছিলেন ।"

দাদু এসব মন দিয়ে শুনে মহাখুশি হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই । যা করেছি, ভালর জন্যেই করেছি ।" তারপর বাইরের মাটির দিকে দেখিয়ে বললেন, "ওইখানে পা রাখ্ । ওর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই । পৃথিবীর মাটি আর নিজের পা । ইয়ে কী বলছিলাম, হ্যাঁ, তাই বলে পড়াশুনো থেকে ছাড়ানছোড়ন নেই, বাপু ।" হঠাৎ বাঁদরগুলোর ওপর চোখ পড়তেই কড়া গলায় বললেন, "এরা আজ কাজে যায়নি কেন, পল্টু ?"

পল্টু সরদার লজ্জা পেয়ে বললেন, "বাঃ, আজ যে এনাদের অনারে ছুটি দিয়েছি । অ্যাই পাণ্ডবরা ঢের হয়েছে, এবার এইখানে পা রাখ ।"

পাঁচটা বাঁদর অনায়াসে তাঁর বুকে পা রেখে কাঁধে ঘাড়ে মাথায় চড়ে বসল ।

ছবি : বিমল দাস

সমাপ্ত

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ - ৫ এপ্রিল ২০০৭

অনন্যসাধারণ লেখিকা লীলা মজুমদার। সকলের ভালো-লাগা এই মানুষটি এক-শো বছর আমাদের মধ্যে থেকে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন বহুবিধ কর্মকাণ্ডে। তিনি দার্জিলিং, শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। আকাশবাণীতে শিশু ও নারী বিভাগের সহকারী প্রযোজক ছিলেন। 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার কাজও করেন দীর্ঘদিন। তাঁর 'পদিপিসির বর্মিবাক্স', 'হলদে পাখির পালক', 'বক-বধপালা', 'টংলিং', 'মাকু' প্রভৃতি বহুজন-সমাদৃত রচনা। এই খণ্ডে আছে ৭৯টির বেশি ছোটো-বড়ো গল্প, উপন্যাস, নাটক। আছে বেশ কিছু মূল্যবান প্রচ্ছদ ও অলংকরণ যেগুলি বর্তমান পাঠকসমাজের কাছে হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। সেগুলি সত্যজিৎ রায়, অহিভূষণ মালিক, প্রশান্ত রায়ের মতো বহুবিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা। এ ছাড়া লেখিকা ও তাঁর শিশুপুত্র রঞ্জন মজুমদারের হাতে-আঁকা ছবিও রয়েছে এই গ্রন্থে।